বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সীতানন্দ কলেজ

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের কবিতার বিশেষ আলোচনার জন্য গবেষণা নিবন্ধ

বিষয়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতায় আধুনিক জীবন ভাবনা

গবেষক – সিদ্ধার্থ কুমার মণ্ডল

রোল – PG/VUEGS49/BNG-IIS নম্বর – 2208

রেজিঃ নং – 1490239 of 2019-2020

শিক্ষাবর্ষ – 2022-2023

তত্ত্বাবধায়ক – শঙ্কর কুমার নন্দী

নন্দীগ্রাম ❀ পূর্ব মেদিনীপুর

Scanned with CamScanner

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতায় আধুনিক জীবন ভাবনা

সিদ্ধার্থ কুমার মণ্ডল

গবেষক

12/05/23

তত্ত্বাবোধক

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	সারসংক্ষেপ (Abstract)	1
২.	ভূমিকা (Introduction)	5
৩.	বিষয়ি প্রেক্ষাপট (Background Development)	6
৪.	উদ্দেশ্য (Objective)	7
৫.	আলোচনা (Discussion)	8
	➢ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সৃষ্টি	
	➢ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য	
	➢ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতায় আধুনিক জীবন ভাবনা	
	• অবনী বাড়ি আছো?	
	• যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	
	• এক অসুখে দুজন অন্ধ	
	• আমি দেখি	
	• সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা	
৬.	উপসংহার (Conclusion)	31
৭.	গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)	32

Scanned with CamScanner

সারসংক্ষেপ (Abstract)

এখন সাধারণ মানুষের পঠিত কবিতা মানেই আধুনিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে আধুনিক কবিতা লেখা শুরু করলেও আধুনিক কবিতা পূর্ণতা পায় ত্রিরিশের কবিদের হাতেই। প্রতিটি দশকেই আধুনিক কবিতার উন্নতি অনেক স্পষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে নজরুল ও ত্রিরিশের কবিরা, আগে পরে চল্লিশ পঞ্চাশের ও ষাটের কবিরা আধুনিক কবিতার শুধু ধারা বাহিকতাই বজায় রাখেনি, তারা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেসব তরুণ কবিতা লিখেছেন তাদের ওপরই নির্ভর করছে আধুনিক কবিতার আধুনিক ও সুস্থ ধারা। ত্রিরিশের একজন বিখ্যাত, আধুনিক কবিতাকে প্রভাবিত করেছেন, তিনি হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর একটি কবিতার লাইন 'মৃত্যু পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি' মানুষকে আজও সবকিছু মনে করিয়ে দেয়।

'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটির মধ্য দিয়ে যেন কবির জীবনদর্শন ব্যক্ত হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যে আস্তিক্যবোধের মধ্য জন্ম নিয়েছিলেন সেই আস্তিক্যবোধে নানা কারণে ফাটল দেখা দিতে শুরু করলে কবি এক নৈরাশ্য বেদনার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। সেই পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কবির অন্তর্স্থিত কবিপুরুষও তাঁকে আহ্বান জানাতে পারেন। 'অবনী বাড়ি আছো' এই প্রশ্নসূচক বাক্যটি আসলে প্রশ্নহীনতা। কবি প্রশ্নের অবতারণা করে প্রশ্নহীনতায় যেতে চেয়েছেন। অর্থাৎ বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণহীনতায় যাওয়া বস্তুময়তা থেকে অবস্তুময়তার গভীরে যেতে চাওয়ার কথাই কবিতাটির মূল লক্ষ্য।

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' মৃত্যুকে অতিক্রম করে বাঁচার আনন্দ। এই কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতাটিকে কবি নিজেকে একজন প্রকৃত জীবনপ্রেমিক কবি রূপে নিজেকে তুলে ধরেছেন। মৃত্যুর চেয়ে জীবন যে তাঁর কাছে অনেক বড়ো, বেঁচে থাকাটাই যে একমাত্র সত্য ও সুন্দর এ বিশ্বাসকে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। কবিতাটির শুরুতেই প্রথম পংক্তিতেই কবির এ বিশ্বাসের তীক্ষ্ণ প্রকাশ পাওয়া যায় –

ভাবছি, ঘুরে দাঁরানোই ভালো।

জীবনকে বড়ো কারণে দেখেন বলেই জীবনের সত্য সুন্দরের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধা হয়ে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোকেই ভালো মনে করেছেন। দ্বিতীয় স্তবকে কবি আত্মসমীক্ষায় যখন আমাদের একথা বলেন –

Scanned with CamScanner

এ কালো মেখেছি দু হাতে
এতকাল ধরে
কখনো তোমার করে, তোমাকে ভাবিনি।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার জগৎ মূলত গড়ে উঠেছে বিরহ, বিষাদ, বেদনা-ক্ষোভের সঙ্গে প্রেম, যৌনতা ও রিরংসায়, যদিও তাঁর প্রেমের সিদ্ধি কিন্তু নারীর দেহবন্দি হয়ে না থেকে ঘটেছে। স্বপ্নক্ষরণের মধ্য দিয়ে। এ কারণে তাঁর কবিতা হামেশাই সহজ সরল পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রায়শই রহস্যময় গভীরতার দিকে যাত্রা করেছে। 'এক অসুখে দুজন অন্ধ' কবিতাটি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উড়ন্ত সিংহাসন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ও কবিতাটি যৌন গন্ধ নিয়েও প্রকৃতির অমলিন রূপের ছোঁয়ায় প্রেমের আনন্দঘন রসে সাঁতার কাটতে রহস্যময়তার পরাবাস্তবতার ভেতরে দেখি অবস্থান করেছে। কবিতাটি প্রারম্ভে যা নজর কাড়ে –

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র তোর আমিষগন্ধ
দীর্ঘ দাঁতের করাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
বালিতে আধ-কোমর বন্ধ
এই আনন্দময় করবে
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

'আমিষ গন্ধ' দীর্ঘ দাঁতের করাত 'ঢেউ নীল দিগন্ত' এসব অনুষঙ্গগুলো যে এক রহস্যময় যৌনতার জগৎ কবিতাটির মধ্যে তৈরি করেছে তা স্পষ্ট। যৌনতার গন্ধময় রহস্যের জগতের মধ্যে যেমন আমরা পাই মাংশাসী নারীদের আভাস, তেমনি একইসঙ্গে পাই কবির প্রেমচেতনায় প্রকৃতির রূপ-সৌন্ধর্যের ছোঁয়া। সব মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এক আশ্চর্যসুন্দর পরাবাস্তবতার পটভূম। কবি-কথাতেই যা স্পষ্ট আমরা বুঝে পাই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় আদ্যন্ত নানাভাবে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ ধরা পড়ে। আলোচ্য 'আমি দেখি' কবিতায় মূলত ফুটে উঠেছে প্রকৃতির প্রতি কবির আত্মিক ভালোবাসার ছবি। কবির কাছে এই প্রকৃতির গাছেরা বড়ো তাৎপর্যবাহী। বাগানে গাছ নিয়ে এসে বসাতে বলেছেন তিন।

গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার

Scanned with CamScanner

গাছের সবুজই তাঁর শরীরে আরোগ্য এনে দেবে। কবি তাই শুধুই গাছ দেখতে চেয়েছেন। এর পরেই দ্বিতীয় স্তবকে কবি শক্তি যখন আমাদের, কথা বলেন –

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি
বহুদিন শহরেই আছি
শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘটে...

কবি জানান বহুদিন জঙ্গলে যাননি তিনি আর তাই তাঁর মন এখন বিষণ্ণ। নাগরিক কোলাহল তাঁকে ব্যথিত করে। নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হয় যার দরুণ এত শহরেই কবিকে একঘেঁয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে। শহরের আকাশে বাতাসে অসুখের বীজনু ঘোরে আর সেই অসুখ শহরের সবুজ গিলে খায়। নগরায়ণের দাবিতে যেভাবে পৃথিবী থেকে সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে তার জন্য কবি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এই কবিতায়। কবি তাই বলেন সবুজের অনটন ঘটে।

বাংলা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রবেশ করেন পঞ্চাশ দশকে। যেহেতু তিনি প্রকৃত অর্থে জীবনরসের পথিক কবি ছিলেন। এক অর্থে কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতির কাছে তিনি নিজেকে বার বার নানান রূপমূর্তিতে উন্মোচিত করেন। বলা ভালো, কবিতা হয়ে ওঠে তাঁর আত্ম-চৈতন্য অনুভবের এক-একটা নিত্য নতুন আবিষ্কার। ঠিক এরকমই একটা আত্ম-চৈতন্য অনুভবের কবিতা হল 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' কবিতাটি ১৯৮২ তে প্রকাশিত 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সংকলিত হয়েছে।

'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' নামের আড়ালেই যে মানুষটির একটি চেহারা আমরা অনুভব করে নিই তা হল – এক পোড়খাওয়া জীবন সংগ্রামী মানুষের যে মানুষটা দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে এসেছে। বলা ভালো, অনেক ভয়ংকর সময়ের সাক্ষী সে। যুদ্ধে না গিয়েও সময়ের দংশন তাকে ছাড়েনি, সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার সামাজিক পরিবেশে লেখনে সংসার জীবনে, এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাপনেও। তবু যে সে ভেঙে পড়েনি, তার কারণ তার নির্ভীকতা। কবিতাটির প্রথম স্তবকে কবি আমাদের একথা বলেন –

'যুদ্ধে যেতে হয়নি, তবু গায়ের ক্ষতচিহ্নে
লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা সঠিক মনে হবে

Scanned with CamScanner

তরবারির খর আঘাত কোনখানে পড়েনি?

একটি চোখ রক্ত-ঢেঁড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও'

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যুদ্ধে না গেলেও অনেক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার লোকটাকে সইতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন যে লোকটার কথতা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় টেনে এনেছেন সে লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা। মধ্যযুগ শব্দটি এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই কবির মনে হয়েছে গায়ে ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে যুদ্ধে না গিয়েও।

Scanned with CamScanner

ভূমিকা (Introduction)

শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে কবি হিসাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য পরিচয় তুলে ধরতেই শুধু সক্ষম হয়নি নিজের সুদৃঢ় একটা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন তাঁর মধ্য দিয়ে। কবিতার স্বাতন্ত্র্যতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। আর এ জন্যেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একটা স্বাতন্ত্র্য অবস্থান সৃষ্টি করা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতায়ও শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। শক্তি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের চিত্র নিজেই তুলে ধরেছেন। কবিতার সেই পংক্তি থেকে আলাদা করা যায় তাঁর জীবনের ইতিহাস। আবার আলাদা করা যায় তাঁর কবিতার ইতিহাসও।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ২৫ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমানে ভারত) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা কমল দেবী এবং বাবা রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। যিনি কলকাতার দ্য কাশিমবাজার স্কুল অব ড্রামায় পড়তেন। চার বছর বয়সে শক্তির বাবা মারা যায় এবং পিতামহ তার দেখাশোনা শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে শক্তি কলকাতার বাগবাজারে আসেন এবং মহারাজা কাশিম বাজার পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক দ্বারা মার্কসবাদের পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রগতি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়েক বিয়ে করেছিলেন, যিনি একজন ভারতীয় লেখক। তাদের মেয়ে তিতি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ২৩ মার্চ ১৯৯৫ (বয়স ৬১) তিনি পরলোকে গমন করেন।

Scanned with CamScanner

বিষয়ি প্রেক্ষাপট (Background Development)

শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকলেও কোনো পেশায় দীর্ঘস্থায়ী ছিলেন না। একসময় তিনি দোকানের সহকারী হিসেবে সাক্রবি ফার্মা লিমিটেডে কাজ করেছেন এবং পরে ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোমে (হ্যারিসন রোড শাখায়) শিক্ষকতা করেন। ব্যবসা করার চেষ্টাও করেছিলেন এবং ব্যর্থ হওয়ার পর একটি মোটর কোম্পানিতে জুনিয়র এক্রিকিউটিভ হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৭০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকায় কাজ করেছেন।

মার্চ ১৯৫৬ সালে শক্তির কবিতা 'যম' বুদ্ধদেব বসু প্রকাশিত কবিতা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি কৃত্তিবাস এবং অন্যান্য পত্রিকার জন্য লিখতে শুরু করেন। বুদ্ধদেব বসুও তাকে নবপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য কোর্সে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। শক্তি কোর্সে যোগদান করলেও সম্পূর্ণ করেন নি। ১৯৫৮ সালে শক্তি সিপিআইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধ করে দেন। প্রথম উপন্যাস লেখেন কুয়োতলা। কিন্তু কলেজ জীবনের বন্ধু সমীর রায়চৌধুরির সঙ্গে তার বনাঞ্চল কুটির চাইবাসায় আড়াই বছর থাকার সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় একজন সফল লিরিকাল কবিতে পরিণত হন। একই দিনে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখে ফেলার অভ্যাস গড়ে ফেলেন তিনি। শক্তি নিজের কবিতাকে বলতেন পদ্য। ভারবি প্রকাশনায় কাজ করার সূত্রে তার শ্রেষ্ঠ কবিতার সিরিজ বের হয়। পঞ্চাশের দশকে কবিদের মুখপাত্র কৃত্তিবাস পত্রিকার অন্যতম কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার উপন্যাস অবনী বাড়ি আছো? দাঁড়াবার জায়গা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

Scanned with CamScanner

উদ্দেশ্য (Objective)

ইংরাজি সভ্যতার স্পর্শ সান্নিধ্যে বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়, বাংলা সাহিত্য নানা ধারায় প্রবাহিত হল কাব্য ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা গেল। সাহিত্যিক মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যে রচনায় কৃতিত্ব দেখালে মধুসূদন এবং বাংলা গীতি কবিতা উৎকর্ষ লাভ করল রবীন্দ্রনাথের হাতে। কিন্তু রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ভাব ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকে এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হল। কবিতার ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। কবিতার ভাব-বিষয়বস্তু-রচনারীতি ছন্দ সমস্ত দিক থেকেই এক পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল। এযুগের কবি সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নতুন কিছু করে দেখানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সর্বাঙ্গক্রমে যে তাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন সে কথা জোর দিয়ে বলা যাবে। এই অধ্যায়ে আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সমুদ্র, নদী, বৃষ্টি, গাছ-গাছালি, আকাশ, নক্ষত্র, জঙ্গল, মহুয়া, ফুল, বীজ, টিলা, জ্যোৎস্না, ঝিঁঝি, মেহেদি পাতার ঝোপ, রাত্রি, অন্ধকার, দিন সন্ধ্যা, পাহাড়, পাথর, জীবন-মৃত্যু জীবনের স্বপ্ন আশা, ক্লেশ আবার ভালোবাসা উপস্থাপিত হয়েছে তার কথকতা তুলে ধরাই এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

Scanned with CamScanner

আলোচনা (Discussion)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সৃষ্টি

⊙ **জন্মগ্রহণ –**

২৫ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমানে ভারত) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যে শিশু সেই শিশু আজকের শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

⊙ **পিতা-মাতা ও পারিবারিক পরিচয় –**

তার পিতার নাম রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও মা কমলা দেবী। যিনি কলকাতার দ্য কাশিমবাজার স্কুল অব ড্রামায় পড়তেন। চার বছর বয়সে শক্তির বাবা মারা যায় এবং পিতামহ তার দেখাশোনা শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে শক্তি কলকাতার বাগবাজারে আসেন এবং মহারাজা কাশিম বাজার পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক দ্বারা মার্কসবাদের পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রগতি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'প্রগতি' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন, যা খুব শীঘ্রই পরবর্তীতে মুদ্রিত রূপ নেয় এবং পুনরায় নাম বদলে বহ্নিশিখা রাখা হয়। ১৯৫১ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সিটি কলেজে ভর্তি হন তার এক মামার কাছে, যিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং তার তখনকার অভিভাবক, যিনি শক্তির হিসাব রক্ষকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দেন। একই বছর তিনি ভারতী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৫৩ সালে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

যদিও তিনি বাণিজ্য অধ্যয়ন ছেড়ে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক অধ্যয়নের জন্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা) ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষায় উপস্থিত হননি।

১৯৫৬ সালে, শক্তিকে তার মামার বাড়ি ছেড়ে আসতে হয়েছিল এবং তিনি তার মাও ভাইয়ের সঙ্গে উল্টোডাঙ্গায় একটি বস্তিতে চলে যান। যে সময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে তার ভাইয়ের স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। দারিদ্রের কারণে শক্তি স্নাতক পাঠ অর্ধসমাপ্ত রেখে প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করেন এবং সাহিত্যকে জীবিকা করার উদ্দেশ্যে উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেন।

Scanned with CamScanner

⊙ **কর্মজীবন –**

শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকলেও কোনো পেশায় দীর্ঘস্থায়ী ছিলেন না। একসময় তিনি দোকানের সহকারী হিসাবে সাক্রবি ফার্মা লিমিটেডে কাজ করেছেন এবং পরে ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোম (হ্যারিসন রোড শাখার) শিক্ষকতা করেন। ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং ব্যর্থ হওয়ার পর একটি মোটর কোম্পানিতে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৭০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় কাছ করেছেন।

⊙ **ব্যক্তিগত জীবন –**

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছিলেন, যিনি একজন ভারতীয় লেখক। ১৯৬৫ সালে আড্ডার মধ্য দিয়ে তাদের প্রথম সাক্ষাত ঘটে। তাদের মেয়ে তিতি চট্টোপাধ্যায়।

⊙ **সাহিত্যকর্ম –**

মার্চ ১৯৫৬ সালে, শক্তি কবিতা 'যম' বুদ্ধদেব বসু প্রকাশিত কবিতা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি কৃত্তিবাস এবং অন্যান্য পত্রিকার জন্য লিখতে শুরু করেন। বুদ্ধদেব বসুও তাকে নবপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য কোর্সে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। শক্তি কোর্সে যোগদান করলেও সম্পূর্ণ করেন নি। ১৯৫৮ সালে শক্তি সিপিআইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধ করে দেন। পঞ্চাশের দশকে কবিদের মুখপাত্র কৃত্তিবাস পত্রিকার অন্যতম কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার উপন্যাস **'অবনী বাড়ি আছো'** দাঁড়াবার জায়গা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। রূপচাঁদ পক্ষী ছদ্মনামে অনেক ফিচার লিখেছেন। ১৯৬০ এর দশকে তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ হে প্রেম হে নৈশবপদ ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় দেবকুমার বসুর চেষ্টায়।

⊙ **হাংরি আন্দোলন –**

১৯৬১ সালের নভেম্বরে ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে যে চারজন কবিকে হাংরি আন্দোলন-এর জনক মনে করা হয় তাদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। অন্য তিনজন হলেন সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায় এবং মলয় রায়চৌধুরী। শেষোক্ত তিনজনের সঙ্গে সাহিত্যিক মতান্তরের জন্য ১৯৬৩ সালে তিনি হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীতে যোগ দেন। তিনি প্রায় ৫০ টি হাংরি বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম সাহিত্যিক মহলে একত্রে উচ্চারিত হতো, যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাংরি

Scanned with CamScanner

আন্দোলন এর ঘোর বিরোধ ছিলেন এবং কৃত্তিবাস পত্রিকায় ১৯৬৬ সালে সে মনোভাব প্রকাশ করে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

⊙ **সম্মান ও স্বীকৃতি –**

১৯৭৫ তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে, তার যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি একাধিক পুরস্কারের পেয়েছেন।

⊙ **জীবনাবসান –**

১৯৯৫ সালে ২৩ মার্চ শান্তিনিকেতনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য

শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকৃতই জীবনরসের পথিক কবি। এ কারণে তিনি অন্তঃসারশূন্য সময় সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়েও সমাজের অন্ধ-কানা গলিতে যেমন চলতে পিছপা হন না, তেমনি চিরাচরিত সমাজের সব নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে ছন্দহীনতায় ভবঘুরের মতন জ্বলে পুড়ে নিজের অন্তরের সব জ্বালা-যন্ত্রণা প্রকৃতির অমল জ্যোৎস্নায় ধুয়ে নিয়ে ফের ফিরে আসেন আত্মসমীকরণের পথ ধরে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়াতে নষ্ট সময়, ধ্বস্ত সমাজ আর আলোছায়ার মিশ্রিত মানুষের কাছে। সব স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ পান করে শেষমেষ ভালোবেসে ফেলেন চারপাশের চলমান জগৎকে, এমনকি নিজেকেও। এ কারণে তাঁর কবিতায় রাগ অভিমানের যেমন তুমুল বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে বিশ্বাস – অবিশ্বাস, প্রেম ও প্রেমহীনতার ছায়াছবি। এ সবই ঘটেছে তাঁর জীবনের ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়ে, কখনও ছন্দে, বা কখনও ছন্দহীনতায় চলার ভেতর দিয়ে। বলতে কোন সংকোচ নেই, এ কারণেই কবি শক্তি যেমন স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন আবার স্বপ্ন দেখাতেও ভালোবাসেন।

প্রথমত – 'অবনী বাড়ি আছো?' কবিতাটিতে ও কবির মনের যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে। এটি একটি সাংকেতিক কবিতা। এ কবিতাটিতে বলতে নেই, যুগ সচেতন কবি শক্তিকে আমরা পুরোপুরি খুঁজে পাই। এ আধুনিক যুগের সম্পর্কে যে তিনি হাতশ তা ব্যক্ত হয়েছে চারপাশের জানলা বন্ধ করে দেবার মধ্যে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত – 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' মনে রাখতে হবে এই প্রাগঢ় মৃত্যুচেতনা কিন্তু কবি শক্তির মনে অসম্ভব জীবনকে ভালোবাসার জন্য। অসম্ভব ভালোবাসাই মৃত্যুকে একরকম জয় করার শক্তি দেয়। তাঁর এই কবিতায় ফের যখন বলেন তিনি একথা 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমু খাবো' তখন কবি শক্তির সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পায় আর প্রকাশ ঘটে স্নেহশীল পিতার এক গভীর প্রেম।

তৃতীয়ত – 'এক অসুখে দুজন অন্ধ' বলতে কবি যে সৃষ্টির নির্মাণযজ্ঞে স্ত্রী-শক্তি ও পুরুষ-শক্তির কথাই ঠারে ঠোরে বোঝাতে চেয়েছেন এ আমরা ধরে নিতে পারি। 'অন্ধ' শব্দটি মোহাচ্ছন্নতার প্রতীকী ব্যঞ্জনা বলে আমরা ধরে নিতে পারি। নারী-পুরুষ উভয়েই কামনায় বশবর্তী হয়ে মোহাচ্ছন্নতার ঘোরেই যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়।

চতুর্থত – 'আমি দেখি' কবিতাটি একটি সার্থক প্রকৃতি প্রেম নিয়ে শেষমেষ হয়ে উঠেছে কবি শক্তিরই একটি অনবদ্য জীবনবাদী কবিতা। জীবনের চলমান প্রবাহ সব সময় আপন আত্মবিশ্বাস ও প্রেমে বুঁদ হয়ে গতিময় থাকুক এ ছিল তাঁর একান্ত কামনা।

পঞ্চমত – 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' নামের আড়ালেই যে মানুষটির একটা চেহারা আমরা অনুভব করে নিই তা হল – এক পোড়খাওয়া জীবনসংগ্রামী মানুষের, যে মানুষটা দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে এসেছে। বলা ভালো, অনেক ভয়ংকর সময়ের সাক্ষী সে।

Scanned with CamScanner

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতায় আধুনিক জীবন ভাবনা

অবনী বাড়ি আছো

'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় কবিতা। কবিতাটি "ধর্মে আছো জিরাফেও আছো" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এটি সাংকেতিক কবিতা। কেউ কেউ এ কবিতায় ওয়াল্টার জি লা মেয়ারের 'The Listeners'-এর ছোঁয়া খুঁজে পান। যেহেতু 'অবনী বাড়ি আছো?' কবিতাটিতে এক আগন্তুকের কথা আছে, এবং আগন্তুকের মুখে প্রশ্ন – কেউ কি এখানে আছে? এই 'অবনী বাড়ি আছো?' মধ্যে কেউ কি এখানে আছে? – র এক আপাত মিল বা সাদৃশ্য যাই বলি না কেন তাঁরা খুঁজে পান। তাই নির্দ্বিধায় তাঁরা রায় দিয়ে দেন – 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটি ওয়াল্টোর ডি লা মেয়ারের 'The Listeners' কবিতাটির ছায়ায় লিখিত। এ ব্যাপারে কতটা সত্যাসত্য আছে আমি জানি না। তবে এই কবিতাটির মধ্যে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে যুগ-সচেতনসম্পন্ন কবিরূপে শক্তিকে আমরা পাই। আগন্তুক প্রতীকের মধ্যেই রয়েছে তার ইঙ্গিত।

মনে রাখতে হবে, আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে কবি হতাশ। তাদের একমাত্রিক জীবনের জন্য কবি স্বভাবতকারণে তাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। তাদের জীবনগুলো যেন কেমন বধির। ব্যক্তিস্বার্থ তাদের জীবনের গণ্ডী কেমন যেন ছোটো করে দিয়েছে। উন্মুক্ত জগতের দিকে তাদের তাকাবার ফুরসৎ নেই। এক কৃত্রিম যন্ত্রচালিত জীবন যেন তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। ছকবন্দি রুটিন মাফিক জীবন তাদের। মধ্যবিত্তের সামান্য সাজানো-গোছানো জীবনের মধ্যেই থাকতে তারা অব্যস্ত। কোনো সাতেপাঁচে থাকতে চান না। সব সমস্যা এড়িয়ে চলাই যেন তাদের ধর্ম। তারা সময়ের কোনো আঁচই গায়ে মাখতে চান না। এসব ব্যাপারগুলো সম্ভবত কবি শক্তিকে বড়োবেশি ভাবিত করেছিল বলে আমার বিশ্বাস। তিনি যেহেতু জীবনপ্রেমিক কবি ছিলেন, তাই এগুলোকে তাঁর কেন জানি মনে হয়েছিল – নিষ্ফল, অর্থহীন। তাই কবি শক্তি যখন বলেন কবিতাটির শুরুতে আমাদের একথা –

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

Scanned with CamScanner

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, কবি 'দুয়ার এঁটে' কথাটির মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষদের সময়ের সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে চলার প্রবণতার কথাকে এখানে ব্যক্ত করেছেন। 'ঘুমিয়ে আছে পাড়া' কথাগুলির মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের স্থবিরতার কথাই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। বহির্জগতের কোনো আঁচই যাতে তাদের দেহ-মনে স্পর্শ করতে না পারে – তার জন্যই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের এই দুয়ার এঁটে ঘুম। 'কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া' এই শব্দ কটির মধ্য দিয়ে কবি তাঁর মানবিক-সত্তা জাগরণের কথাই ব্যক্ত করেছেন। বহির্জগতের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে এড়িয়ে সবাই দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে পড়লেও – কবি কিছুতেই ঘুমতে পারছেন না। তাঁকে জেগে থাকতে হয়। এই জাগাটা আসলে কবির এক মানবিকবোধের জন্য। সবাই বহির্জগতের পারিপার্শ্বিকতা থেকে দূরে থাকতে চাইলেও – কবি কিন্তু তা পারেন না। সমাজসচেতনতা বোধই তাকে থাকতে দেয় না। তাই ঘুমন্ত পুরীতে কবি একা জেগে থাকেন। জাগরণের মধ্যে দিয়ে তিনি শুনতে পান রাত্রির ডাক – 'অবনী বাড়ি আছো?' এ রাত্রির ডাক কিন্তু সময়ের, বহির্জগতের পারিপার্শ্বিকতার।

এখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই অবনী কে? অবনী মানে তো পৃথিবী। কবিতাটির রহস্য এখানেই। এখানেই রয়েছে কবিতাটির মূল চাবিকাঠি। এই রহস্যময়তাই কবিতাটিকে দিয়েছে একটা আলাদা সৌন্দর্য। আমার কিন্তু কেন জানি মনে হয়, এ অবনী আর কেউ নয় – কবি নিজেই। বরং এভাবে বলা ভালো অবনী হলেন কবির অন্তরাত্মা, যে প্রতিনিয়ত কবিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, এই অবনীই কবির ভেতরের পুরুষটাকে জাগিয়ে তুলে দূর করে দিতে পারে পৃথিবীর সময়-সংকটের যা কিছু অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর, অশুভ সে সব চিহ্নগুলিকে। এ কারণেই ঘুমন্তপুরীতে কেবল অন্তরাত্মাই জেগে বসে থাকে। এভাবেও বলা যায় – কবিই যেন কেবল এ অন্তরাত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকেন। সেই রাত্রের আহ্বান কেবল তিনিই একমাত্র শুনতে পান। এ আহ্বান বহির্জগতের!

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে কবি এক বর্ষণের চিত্র অঙ্কন করে নিসর্গের অপরূপ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলেন। কবি-কথাতেই যা ফুটে উঠেছে –

বৃষ্টি পড়েএখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস

Scanned with CamScanner

দুয়ার চেপে ধরে –

বারোমাস বৃষ্টির পড়ার মধ্যে আমাদের চোখের সামনে যে চিত্রটি স্পষ্ট উঠে আসে তা হল পাহাড়ী এলাকার পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘ ঘুরে বেড়ায়। কবির মেঘকে গাভীর সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে রয়েছে কবির অনুপম এক সৌন্দর্যবোধ। 'গাভীর' প্রতীকী ব্যঞ্জনা এনে মেঘের অনুপম সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্তভাবে রসসমৃদ্ধ করেছেন বলা যেতে পারে। গাভীরা সাধারণত চরে বেড়ায় ঘাসের প্রত্যাশায়। ঘাসের কথা এনে কবি আসলে এখানে আমাদের সামনে এক প্রতিকূল অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। 'পরাঙ্মুখ' অর্থাৎ প্রতিকূল সে 'ঘাস' যেন কবির বদ্ধ গৃহের দরজা চেপে ধরে। এই দুয়ার চেপে ধরার মধ্যে এক দুর্যোগের কথাই চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। ঘাস এখানে প্রতীকী মাত্র। বাইরের দুর্যোগ, অর্থাৎ বহির্জগতের পারিপার্শ্বিকতার আহ্বান কবি যেন উপেক্ষা করতে পারেন না। সে ডাক – শুভ না, অশুভ কবি মানতে চানও না যা সমাজ সচেতন কবির চৈতন্যসত্তাকে জাগিয়ে তোলে।

আবার তৃতীয় স্তবকে কবি যখন বলেন আমাদের একথা –

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না – কবি ঘোর বর্তমানকে আমাদের সামনে নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি' এ কথার মধ্যে যা প্রস্ফুটিত হয়েছে। ব্যথা – কীসের ব্যথা? এ ব্যথা হল কবি-মনের। বর্তমান একমাত্রিক স্বার্থপরতার! যা কবি মনকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করছে, রক্তাক্ত করে তুলেছে। এভাবেই কবি চলমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বর্তমানের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তাঁর কবি-মনের ভেতরের বেদনার নীরব এক অনুচ্চারিত দীর্ঘশ্বাস আমাদের কাছে তুলে ধরেন 'আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী' এ কথার মাধ্যমে। তবু কবি যেহেতু জীবনপ্রেমিক, সত্য ও সুন্দরের পূজারী তাই হৃদয়ের ব্যথা-ক্ষতকে সঙ্গী করে ঘুমিয়ে থাকতে তান না। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের কাছে পা বাড়াতে চান। তাই তিনি ফের রাতে কড়ানাড়ার শব্দ অনুভব করেন। এই কড়ানাড়ার শব্দেই রয়েছে সে ডাক। সহসা শব্দটি যেন রাত্রির আহ্বানকে অর্থপূর্ণ করেছে। 'সহসা' শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দ্বন্দ্বিকচেতনায় কবি-

Scanned with CamScanner

অন্তরের এক সুপ্তবোধ। যে বোধ তাঁর ঘুম কেড়ে নিয়ে রাতের আহ্বানে বহির্জগতের সঙ্গে মিলনের ডাক দেয়। কাজেই, এই 'অবনী বাড়ি আছো?' কবিতাটিকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমাজসচেতনতা বোধের এক আত্ম-উন্মেষের কবিতারূপে আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। কেননা, এই কবিতাটিতে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়-জাগরণের কথাই ব্যক্ত করেছেন বলে আমার মনে হয়।

যেতে পারি কিন্তু কেন যাব?

"আমি চলে যেতে পারি" কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হল 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?' কবিতাটি।

এই কবিতাটি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতাটিতে কবি নিজেকে একজন প্রকৃত জীবনপ্রেমিক কবি রূপে নিজেকে তুলে ধরেছেন। মৃত্যুর চেয়ে জীবন যে তাঁর কাছে অনেক বড়ো, বেঁচে থাকাটাই যে একমাত্র সত্য ও সুন্দর এ বিশ্বাসকে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে।

কবিতাটি শুরুতেই প্রথম পংক্তিতেই কবির এ বিশ্বাসের তীক্ষ্ণ প্রকাশ পাওয়া যায় –

ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

জীবনকে বড়ো করেন দেখেন বলেই জীবনের সত্য-সুন্দরের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোকেই ভালো মনে করেছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে কবি আত্মসমীক্ষায় যখন আমাদের এ কথা বলেন –

এত কালো মেখেছি দু হাতে
এক কাল ধরে।
কখনো তোমার করে, তোমাকে ভাবিনি।

তখন বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না – ময়লা আবর্জনার দুঃসহ অন্ধকারে কবি জীবন অতিবাহিত করে গেছেন এতকাল, কিন্তু তাঁর প্রকৃত বোধ তখন জন্মায়নি বলেই তিনি জীবনের কথা ভাবেননি যে জীবন প্রিয়জন পরিবৃত্ত আনন্দ ও সুন্দরকে একসঙ্গে ভাগ করে নেবার। বলতে গেলে ময়লা আবর্জনায় দুঃসহ অন্ধকারময় জীবন কবিকে শুধু গ্রাস করেই নেয়নি, কবিকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ একাকীত্বময় জীবনযন্ত্রণার সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কবি যেন আজ সেখান থেকে

Scanned with CamScanner

মুক্তি চান। এমনকি চান ফিরে যেতে প্রিয়জনের সুখ-আনন্দের সাহচর্যে এক সুন্দর উচ্ছল গতিময় জীবনের কাছে যে জীবন সত্য ও সুন্দর।

তবে কি, ভোগলিপ্সা কবিকে সরিয়ে নিয়েছিল চেতনার রাজ্য থেকে অচেতনের দিকে? আপন স্বার্থপরতার জন্য প্রিয়জনদের পাশ থেকে? কিংবা এও হয়তো হতে পারে, চারপাশের ক্ষয়াটে মূল্যবোধহীন যন্ত্রসভ্যতার চাপে ও তাপে কবি দগ্ধিতে হয়ে জীবনানন্দের মতন অনুভব করেছিলেন এ সত্য – 'পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ'কে। যাইহোক – কবি শেষপর্যন্ত আপন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সময়যন্ত্রণার কালিহাত মুছে যে প্রকৃতই প্রিয়জনের হাসি-আনন্দের সুখগন্ধ জীবনের চৌহদ্দিতে ফিরতে চান পুনরায় তাদের সকলের জীবনের অংশীদার হয়ে তা ইঙ্গিতময়তার স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন আমাদের। চান এককীত্ব থেকে মুক্তি।

তৃতীয় স্তবকে আবার কবি যখন আমাদের বলেন এ কথা –

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতকাঠ ডাকে : আয় আয়

আমরা পেয়ে যাই জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দোলায়মান মানসিকদ্বন্দ্বে জর্জরিত সেই কবিকে, যিনি জীবন ও মৃত্যুর নাটকের এক কুশীলব। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবির চৈতন্য-ভূমিতে যেন এক আলোছায়ার লুকোচুরি চলে। তাই দেখি স্বপ্নে খাদের পাশে রাত্তিরবেলায় দাঁড়ালে কবি শুনতে পান চাঁদের হাতছানি। জীবনমুখী চাঁদ যেন জীবন সৌন্দর্যের মায়াময় রূপ নিয়ে তার নিঃসঙ্গ জীবনের পরিধি ভেঙে চলে আসার জন্য ডাকছে। আবার, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে একাকী গঙ্গার তীরে দাঁড়ালে তিনি শুনতে পান মৃত্যুরূপী চিতাকাঠের ডাক।

'চাঁদ' কবির কাছ জীবনের সত্য-সুন্দরের প্রতীক রূপে যেমন ধরা দেয়, তেমনি 'চিতাকাঠ' তাঁর কাছে মৃত্যুর প্রতীক রূপে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু কবি যে চেতনসম্পন্ন সুন্দর অনুভূতিময় প্রিয়জনের কাছে, অর্থার চলমান জীবনের কাছে ফিরতে চান! বলা ভালো, জীবনের কাছে ফেরাটাই তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষার রূপ নেয়, তাই দেখি কালক্ষেপ না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন – অমূল্য জীবন ছেড়ে, প্রকৃতির মোহময় রূপগন্ধ-আলো ছেড়ে তিনি শীতলতম মৃত্যুর অন্ধকারে যাবেন না।

Scanned with CamScanner

মৃত্যুর অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডাকলেও না।' চিতকাঠের ডাক' –এ সাড়া না দিয়ে জীবনপ্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দৃঢ়ভাবে তাই মৃত্যুকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে –

যেতে পারি

যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি

কিন্তু, কেন যাবো?

জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য – এ বোধ কবির আছে। তবু আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত না করে তিনি যাবেন না। সংগ্রামমুখর জীবনের কাছ থেকে মোদ্দাকথা পালিয়ে তিনি মৃত্যুর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে যেতে চান না। ভয়ে, ক্লান্তিতে, বিষাদে তিনি একাকী পরিজনদের ফেলে চুপি চুপি যেতে চান না। তিনি চান তাঁর জীবনের সব ক্ষত চিহ্নগুলি ধুয়ে সন্তান-পরিবৃত আত্মীয়-প্রিয়জন নিয়ে ভালোবাসার এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে সত্যিকারের জীবনের হাসি-আনন্দকে উপভোগ করতে, বলতে গেলে জীবনের বেঁচে-বর্তে থাকার যথার্থ অর্থকে অনুভব করতে। তাই তিনি চান 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমু' খেয়ে জীবন সমুদ্রে নৌকা বাঁধতে। সন্তানের মধ্যেই যে নিহিত রয়েছে তাঁর আত্মবীজ! তাই সন্তানের মধ্যেই কবি খুঁজতে চান জীবনের বেঁচে-বর্তে থাকার প্রকৃত সত্যকে। তাই বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন না দ্বান্দ্বিকতায় দোদুল্যমান অন্তরের সব বেড়া ভেঙে –

যাবো

কিন্তু, এখনি যাবো না

তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো

একাকী যাবো না, অসময়ে।

কবি অবুঝ নন, জানেন পৃথিবীতে চিরকাল কেউ বেঁচে থাকে না। কিন্তু এখনই তিনি পৃথিবী ছেড়ে অসময়ে চলে যেতে চান না। 'অসময়' বলতে তিনি অবক্ষয়িত মূল্যবোধহীন দগ্ধ-যন্ত্রণাময় সময়ের কথাই বলতে চেয়েছেন? যেখানে প্রত্যহ ভয়, আর ক্লান্তি-বিষাদের বিচ্ছিন্নতায় কবি জীবন অতিবাহিত হচ্ছে? ---এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মনে ভেতরে এসে পড়ে। এর মধ্যেও কবি কিন্তু সংসারচক্র ছিন্ন করে যেতে চান না, না যাওয়ার কারণ হয়তো কবির সাধ অপূর্ণতা। সন্তান-সংসার সবকিছু ছেড়ে একাকী যাবার আগে কবি চান জীবনের কাছে আত্মবিশ্বাসে ঘুরে দাঁড়াতে। তাঁর ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে কিন্তু রয়েছে এক শুভচৈতন্য-সম্পন্ন ভাবীকালের ইঙ্গিত। জীবন কবির কাছে এক আনন্দভুবন, তাই বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়ে একাকী যেতে চান না। সকলের ভেতরে

Scanned with CamScanner

ভালোবাসার বীজ বপন করে তিনি চান সকলের মধ্যে জীবনের প্রকৃত প্রত্যয়বোধ ছড়িয়ে যেতে। এই হল কবির একমাত্র প্রার্থনা। ব্যর্থতায় নয়, নৈরাশ্যে নয় জীবন-সংসারকে ভালোবেসে জীবনের হাতে ভালোবাসার উজ্জ্বল রাখী পরিয়েই তিনি যেতে চান। এ যাওয়া এক অর্থে প্রকৃত জীবনপ্রেমিকের! 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?' কবিতাটির আসল সার্থকতা এখানেই।

এই কবিতাটিতে বলতে গেলে যে জীবনসত্যটি ধরা পড়ে – তা হল সন্তানের প্রতি অমোঘ ভালোবাসায় এক অন্য স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৃত ভালোবাসাপূর্ণ জীবনের পূর্ণতার কাছে পৌঁছানো। 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমু খাবো' কথাতেই যার পরিচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। পুত্র যেহেতু পিতার উত্তরাধিকার, সেহেতু কবি মনে করেন তাঁর জীবনের অপূর্ণতার সমস্ত ফাটলগুলো একমাত্র পুত্রই বদ্ধ করে মায়াময় জীবনের পূর্ণতায় ভরিয়ে তুলতে পারে। তাই কবি আকাঙ্ক্ষা করেছেন, পুত্রের সঙ্গে জীবনের আনন্দ কিছুকাল মন্থন করতে।

আসলে, কবি জীবনকে সন্তান স্নেহে পিতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে পূর্ণানন্দ সংসারময় জীবনের প্রকৃত আস্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে যেতে চান না। যথার্থ সুখ যে লুকিয়ে আছে দুঃখ-যন্ত্রণায় ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের উত্তরণে – এ সত্য কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জীবন-অভিজ্ঞতার পরতে পরতে, তাই তিনি 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমু' না খাওয়া পর্যন্ত যেতে চান না। বলতে গেলে, মৃত্যুর চেয়ে জীবন যে শুধু বড়োই না – অনেক অর্থময়, আলোময় তা এ কবিতায় স্পষ্ট করেছেন। সত্যিই তারিফযোগ্য এই কবিতাটি। মানবজীবনের এটি একটি প্রকৃতই সত্যিকারের জীবন-সন্দর্শনের কবিতা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

এমনকি, সহজ সরল কবির অন্তরদীপিত সাবলীল উচ্চারণে কবিতাটি নির্বোধ প্রকাশ ভঙ্গিও দৃষ্টিনন্দন ও একই সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী যা সহজেই পাঠকের অন্তরলোকে ঢুকে পড়ে। ঘা-ও দেয় বোধলোকে জীবনজিজ্ঞাসার ঝড় তুলে!

এক অসুখে দুজন অন্ধ

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার জগৎ মূলত গড়ে উঠেছে বিরহ, বিষাদ, বেদনা-ক্ষোভের সঙ্গে প্রেম, যৌনতা ও রিরংসায়। যদিও তাঁর প্রেমের সিদ্ধি কিন্তু নারীর দেহবন্দি হয়ে না থেকে ঘটেছে স্বপ্নস্ফরণের মধ্য দিয়ে। এ কারণে তাঁর কবিতা হামেশাই সহজ সরল পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রায়শই রহস্যময় গভীরতার দিকে যাত্রা করেছে। 'এক অসুখে দুজন অন্ধ' কবিতাটি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'উড়ন্ত সিংহাসন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটি যৌনগন্ধ নিয়েও প্রকৃতির অমলিন

Scanned with CamScanner

রূপের ছোঁয়ায় প্রেমে আনন্দঘন রসে সাঁতার কাটতে রহস্যময়তার পরাবাস্তবতার ভেতরে দেখি অবস্থান করেছে। কবিতাটি প্রারম্ভেই যা নজর কাড়ে –

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ
দীর্ঘ দাঁতের করাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
বালিতে আধ-কোমর বন্ধ
এই আনন্দময় কবরে
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

'আমিষ গন্ধ', 'দীর্ঘ দাঁতের করাত', 'ঢেউ নীল দিগন্ত' এসব অনুষঙ্গগুলো যে এক রহস্যময় যৌনতার জগৎ কবিতাটির মধ্যে তৈরি করেছে তা স্পষ্ট। যৌনতার গন্ধময় রহস্যের জগতের মধ্যে যেমন আমরা পাই মাংসাশী নারীর শরীরের আভাস, তেমনি একইসঙ্গে পাই কবির প্রেমচেতনায় প্রকৃতির রূপ—সৌন্দর্যের ছোঁয়া। সব মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এক আশ্চর্যসুন্দর পরাবাস্তবতার পটভূমি। এই পরাবাস্তবতার পটভূমিতে কবিপ্রেম যে নারীশরীরের আনন্দঘন রসে সম্পৃক্ত, মোহাচ্ছন্ন তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। কবি-কথাতেই যা স্পষ্ট আমরা বুঝা যাই।

প্রাবন্ধিক বিজয় সিংহ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ক-টি কথা বলেছেন, যা এখানে প্রণিধানযোগ্য –

'শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের, স্পর্শেরও বটে, যেমন বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে, মনে পড়ে যায়। সমুদ্র – এই মেটাফরের সূত্রে আমিষ গন্ধ, বাতাস ও নীল ঢেউ-এর সম্মিলনে তৈরি হয় দীর্ঘ এক যৌন আবহ। যৌনতার সঙ্গে মিশে যায় অবচেতনের গূঢ়তা আর প্যাশনের বহুধাবিচ্ছুরিত তীব্রতা। বাতাসের সঙ্গে সমুদ্রের শঙ্খলাগার ছবি ক্রমশ নিয়ে যায় আরও যৌন মত্ত গভীরতায়, যখন দীর্ঘ দাঁতের করাত ও ঢেউ নীল দিগন্তকে কামড়ে ধরা জাগ্রত চুম্বনের আধোলীন সংসক্তি মগ্নচৈতন্যের ভাষা পেতে থাকে। বালিতে আধ কোমর বন্ধ চিত্রযোগে শরীরী মিলনের তীব্রতম সংবেদ পৌঁছে দেয় আসক্ত এবং অসামান্য একটি শব্দবন্ধ আনন্দময় কবর –এ, নারী যৌনচিহ্নের এই গাঢ় অনুবাদে।'

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত কথাগুলি মেনে নিলেও – আমি কিন্তু 'এক অসুখে দুজন অন্ধ' কবিতাটিকে 'আতপ্ত শৃঙ্গার রসের কবিতা' বলে কবিতাটির আলোচনায় যে মন্তব্য করেছেন উপরিউক্ত কথা বলার পরে তা মানি না। সমর্থনও এক ছিটেও করি না। তবে, কবিতাটি যে একটি নিটোল দেহজপ্রেমের কবিতা তা জোরগলায় বলা যেতে পারে। শৃঙ্গার রসের কবিতা হতে গেলে যে গুণগুলো বেশি রকমের থাকা দরকার তা সেভাবে আদ্যন্ত-কবিতাটিতে রূপায়িত হয়ে ওঠেনি। বরং বলা যায়, কবি বুদ্ধদেব বসু-র 'বন্দীর বন্দনা'র মতন ইন্দ্রিয়াতীত ভালোবাসার উষ্ণপ্রেমের রসচ্ছটায় দেদীপ্যমান এ কবিতাটি। প্রকৃতির অনুষঙ্গ ও কবিতায় অনেকটা ভিয়েনের কাজ করেছে।

যাইহোক কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকেও কিন্তু আমরা অপরূপ সঙ্ঘবদ্ধ চিত্রকল্পে চিত্রায়িত হতে দেখি কবিপ্রেমের যৌন-আসক্তির গহিন সংরাগ –

হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশি সেই সোনার অধিক
উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর
আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়
আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি?

এখানে কবি রহস্যময় পরাবাস্তবতার পথে না হেঁটে ইন্দ্রিয়াসক্তির কথা সহজভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন কোনও রাখঢাক না রেখে। দুখানি যে হাত গলা জড়িয়ে আছে তা যে একজন যুবতী নারীর হাত তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে সে হাত যখন সোনার মতন প্রখর উজ্জ্বল এবং উষ্ণ ও রোমাঞ্চকর। একজন পুরুষের কাছে কাঞ্চনবর্ণা যুবতীনারীর হাত যে সোনারই মতন মহার্ঘ্য বা দুর্লভ বস্তু বলে বিবেচিত হবে, এবং সে নারীহাতের স্পর্শ যে পুরুষটির দেহ-মনকে ক্রম রোমাঞ্চিত করবে এটাই স্বাভাবিক। করেছেও তাই। কেননা, নারী-শরীরের মধ্যেই যে রয়েছে টইটুম্বুর যৌন-প্রেমরসের ভাণ্ডার! কবি এও বোঝেন প্রেম-কাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাছে নারীর শরীর চিবুক থেকে নখ পর্যন্ত আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় চরম সুখানুভূতিতো সঞ্চার করেই, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটির হৃদয়-মন সবকিছুকে তোলপাড় করে ফেলে। মাটিকে আঁকড়ে বৃক্ষের শেকড় যেমন পায় আনন্দ, বেঁচে-থাকার আনন্দ-সুখানুভূতির নিশ্চিন্ততা, তেমনি পুরুষও যে নারীশরীরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে যৌনসম্ভোগের ভেতরে পায় পরম আনন্দ-সুখানুভূতি ও পূর্ণায়ত গভীর প্রেমকে।

Scanned with CamScanner

'পুচ্ছ' শব্দটি কবি খুব ভেবেচিন্তে রতিপ্রেমকে গভীরতার ভেতরে ছড়িয়ে বিস্তারিত করে দেবার অর্থে প্রতীকী-ব্যঞ্জনা হিসেবে ব্যবহৃত করেছেন বলা যেতে পারে।

তৃতীয় স্তবকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রেম-কে যেন আরও প্রোজ্জ্বল করার লক্ষ্যে যৌনতার টুকরো টুকরো অভিব্যক্তিমূলক ছবিগুলি এক আপাত বাস্তবসন্দর্শনের ক্যানভাসে যেন নিপুণ চিত্রকরের মতন ইঙ্গিতময়তার আমাদের তুলে ধরেন। যা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এ যেন কবি-আত্মার এক অন্য ভুবন, এক গৃহপ্রেমের আবদ্ধ থাকার বাসনা ছবি –

সঙ্গে আছেই
রুপোর গুঁড়ো, উড়ন্ত নুন, হাল্কা হাওয়ার মধ্যে, কাছে
সঙ্গে আছে
হনয়ি পাগল,
এই বাতাসে পাল্লা আগল
বন্ধ করে
সঙ্গে আছে....
এখন অসুখের দুজন অন্ধ!
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

মানবসংসারে স্বামী-স্ত্রীর গৃহগত প্রেমের জীবনযাপনের ভেতরে যতই পবিত্রতা থাক না কেন – একটা যৌনতার সম্পর্ক যে আছে কবি সে কথাই যেন আমাদের ইঙ্গিতে বলেছেন। এ কথাতো স্পষ্ট – মানবসংসারে কোনও নারীই যেমন পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন ছাড়া মাতৃত্বের অধিকারী হতে পারেন না, তেমনি কোনও পুরুষও নারীদেহ সম্ভোগ না করে পিতা হতে পারেন না। 'এক অসুখে দুজন অন্ধ' কবির বলা এ কথার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি রহস্যের বাস্তব সত্যটি। প্রেমের প্রগাঢ় হৃদয়পূর্ণ ভালোবাসার নারী-পুরুষ উভয়ের দেহমিলনেই রয়েছে নতুন প্রজন্মের বার্তা। যৌনতা এক অর্থে 'প্রেমতৃষ্ণা'। যৌন-সম্ভোগের মধ্য দিয়েই যেমন প্রজনন ঘটে, তেমনি নারী-পুরুষ উভয়েই লাভ করে তৃপ্তি।

'এক অসুখে দুজন অন্ধ' বলতে কবি যে সৃষ্টির নির্মাণযজ্ঞে স্ত্রী-শক্তি ও পুরুষ-শক্তির কথাই ঠারে ঠোরে বোঝাতে চেয়েছেন এ আমরা ধরে নিতে পারি। 'অন্ধ' শব্দটি মোহাচ্ছন্নতার প্রতীকী ব্যঞ্জনা বলে আমরা ধরতে পারি। নারী-পুরুষ উভয়েই কামনায় বশবর্তী হয়ে মোহাচ্ছন্নতার ঘোরেই

Scanned with CamScanner

যৌন-সম্ভোগে লিপ্ত হয়। সে সময় এক-অর্থে আনন্দঘন প্রেমতৃষ্ণার কাঙ্গালপনায় প্রেমের রসসাগরে উভয়েই বাহ্যশূন্য হয়ে পড়ে। লাজ-লজ্জা কোনও কিছুই তখন তাদের দেহ-মনে কোনও প্রতিক্রিয়ার ছাপ ফেলে না। সৃষ্টিতো এমনিই – আপন কর্মে পাগলপারা!

সারসত্য কথাটি হলো – কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'এক অসুখে দুজন অন্ধ' কবিতাটিতে নারী-পুরুষের প্রেমের মহাকাব্যিক দেহবন্ধন ও হৃদয়বন্ধনের চিরন্তন বাস্তবসত্য পূর্ণায়ত আনন্দব্রহ্ম প্রেমের সত্যস্বরূপটিকে ইহলোক মানবজীবনের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। কবিতাটির আসল মাধুর্য এটিই।

কবিতাটির নামকরণে কবির বুদ্ধি মত্তার ছাপ রয়েছে। নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী ও অর্থবহ। আর একটা বিশেষ গুণ এ কবিতায় লক্ষ্য করা যায় তা হলো – দলবৃত্ত ছন্দের সুনিপুণ দোলায় কবি কবিতাটিকে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বেশ রসসমৃদ্ধ শীতল করে তুলেছে, যা সহজেই হৃদয়-বোধকে ছুঁয়ে ফেলে এক আশ্চর্য ভালোলাগার নৃত্যে।

আমি দেখি

কবি জীবানন্দ দাশের প্রকৃতির সঙ্গে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যে এক নিবিড় ভালোবাসার অমোঘ বন্ধন ছিল তা তাঁর কাব্যসমগ্রর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বোঝা যায়। এমনকি, নগর সভ্যতার রসকষহীন সময়ের চাপে ও তাপে তিনি যখন দগ্ধ, বলা ভালো তাঁর কবি-আত্মা যখন ক্ষত-বিক্ষত, বেদনাবিধুর – তখনই তিনি প্রকৃতির কাছে স্মৃতিকাতরতার ভেতর দিয়ে যেমন পেতে চেয়েছেন মনের আরাম, তেমনি নগরকেন্দ্রিক জীবনের ছকবন্দি বেড়া ভেঙে প্রকৃতির সান্নিধ্যে পেতে চেয়েছেন ক্ষণিকের জন্য ক্ষত-বিক্ষত কবি-আত্মার শুশ্রূষা। ঠিক তাঁর পূর্বসূরী তিরিশের কবি জীবনানন্দ দাশের মতন। কবিতার নির্মাণশিল্পে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র গুণ থাকলেও ভাববৃত্তের দিক দিয়ে যে তিনি বেশ খানিকটা কবি জীবনানন্দের সমগোত্রীয় তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না। তা না হলে কবি-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক জহর সেনমজুমদারও একালের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় একথা বলবেনই বা কেন –

> **'আধুনিক যন্ত্রযুগে এসে অধিকাংশ কবিই যখন প্রকৃতির কাছ থেকে দ্রুত সরে গিয়ে নাগরিক অভিক্ষেপে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় তখন যাবতীয় অন্ধকারের ভেতর যেন খুব মৃদু এবং ধীরস্থিরভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের**

Scanned with CamScanner

জন্ম এবং মৃত্যুর চিরন্তন সম্পর্ক খুঁজেছেন। পঞ্চাশের বন্ধু কবিরা বিশেষ করে কৃত্তিবাস পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত সমকালীন কবিরা – অনেকেই এই সময়পর্বে তারুণ্যের তরল উচ্ছ্বাসে ভেসে চলেছেন বস্তুবিশ্বের জৈব তাড়নার দিকে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছিল। আর দেশভাগের মারাত্মক ভ্রম মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছিল। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ এই বিশেষ সময়পর্বে ডুবে যেতে চেয়েছিল ব্যক্তিগত স্বৈরাচারের ভেতর আর উদ্বাস্তু মানুষ তখন ভ্রমিভ্রান্ত বিচ্ছিন্নতাবোধে শিকড়চ্যুতির ক্রন্দনে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল নিখিল বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার প্রকৃতির কথা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তবুও একবারের জন্য বিচ্ছিন্ন হননি প্রকৃতির কাছ থেকে। কেন হননি? তার কারণ একটাই। তাঁর কবিতার মূলমন্ত্র বা স্থায়ী ধ্রুবপদ হলো – ভালোবাসা। এই নিখাদ ভালোবাসাই তাঁকে জুড়ে রেখেছে প্রকৃতি, জীবন এবং মানুষের সঙ্গে।'

জহরবাবুর পর্যবেক্ষণ যে মিথ্যে নয় – তা আমরা অবলোকন করি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মগ্ন-নিবিড় পাঠে। "অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল" কাব্যগ্রন্থের 'আমি দেখি' কবিতাটি যার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কবিতাটির শুরুতে কবি শক্তি যখন স্পষ্টভাবে এ কথা বলেন কোনও ভনিতার ধার না ধেরে –

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া

তখন আমরা পাইনা কি সেই জীবনবাদী কবি শক্তিকে – যার অন্তর সম্পৃক্ত প্রকৃতির সুধারসে। 'গাছ' এখানে কবি শক্তির কাছে স্মৃতিকাতরতায় নাগরিক-ধ্বস্ত জীবনের ওষধি স্বরূপ। মরুময় আধুনিক জীবন যেখানে রসকষহীন অসুস্থতাজনিত শূন্য বাগানের মতন – সেখানে গাছ বসানোর কথা বলে, এবং পরক্ষণে গাছ দেখার দরকারের কথা বলে কবি শক্তি একদিকে যেমন মানব সভ্যতার যান্ত্রিক যন্ত্রণার বেদনার ব্যাপারটি আমাদের কাছে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন, তেমনি একই সঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত দগ্ধিত মনের আরাম পেতে চেয়েছেন। চেয়েছেন যান্ত্রিকজীবন থেকে মুক্তি।

Scanned with CamScanner

নাগরিক-জীবনে প্রকৃতির সান্নিধ্য যে কত প্রয়োজন তা জীবনবাদীকবি শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন একনিষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমিক হওয়ার জন্যে। বলা ভালো, প্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের যথার্থ সত্য-সুন্দর প্রেমের প্রতিমূর্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন – প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন মানুষ কখনও যেমন পূর্ণসত্য আনন্দলাভ করতে পারে না, তেমনি মানবজীবনকে সর্বদা আনন্দময় করে রাখার জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির সঙ্গ। বাস্তব সময়ের দগ্ধ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে একমাত্র মানবজীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে প্রকৃতি। প্রকৃতিই যে সবসময় মনের অসুস্থতা দূর করে দেয় মানবকে আরাম, প্রশান্তি। কবি শক্তি তাই নির্দ্বিধায় কুণ্ঠিত হন না এ কথা বলতে –

গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকারে
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার

প্রকৃতির সঙ্গসুখে কবি শক্তি যেন খুঁজে পান সমস্ত ক্লান্তি-ঘাম ও যান্ত্রিক যন্ত্রণা ধুয়ে উজ্জ্বল তারুণ্য। গাছের সবুজটুকু যার দ্যোতক। এর পরেই দ্বিতীয় স্তবকে কবি-শক্তি যখন আমাদের এ কথা বলেন –

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি
বহুদিন শহরেই আছি
শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘটে....

আমরা সহজেই বুঝে যাই কবির নাগরিক-জীবনে একঘেয়েমি জীবনযাপনের প্রতি তিক্ততা। যা সুন্দরভাবে সহজ কথায় সহজভাবে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন। শুধু কি তিক্ততা? আর কিছু নয়! 'শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়' এই পংক্তিটি আর এক ভয়ংকর কথা বলছে। জনজীবনের চাপে শহর যত বর্ধিত হচ্ছে, ইট-কাঠ-পাথরে সজ্জিত হচ্ছে তত কিন্তু সবুজ, অর্থাৎ খোলামেলা প্রকৃতির বিলোপ ঘটছে। সিধে কথায় বলতে গেলে শহরের বুক থেকে লোপাট হচ্ছে গাছপালার। গাছপালার নিশ্চিহ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সবুজের অনটন ঘটছে। সবুজের অনটন হেতুই মানুষের জীবন যে ক্রমশঃ শূন্য মরুভূমির মতন অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। পরের স্তবকটি পাঠ করলেই কবির ইঙ্গিত যে সেদিকেই তা

Scanned with CamScanner

আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। কবি-কথাতে যা ইঙ্গিতবাহী। তা নাহলে কবি পরক্ষণে আমাদের এরকম নির্দেশ দেবেন কেন –

তাই বলি, গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও আমি দেখি

কবি শহরের সবুজের অনটনজনিত মরুভূমির মতন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চান না বলেই গাছ তুলে এনে বাগানে বসানোর কথা বলেন। 'চোখ তো সবুজ চায়!' এ কথার মধ্যে সুস্বাস্থ্যের বার্তা যেমন আছে, তেমনি একইসঙ্গে কবি গভীর ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে অন্তরের সত্য স্বরূপটি আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। 'চোখ তো সবুজ চায়' এ কথাটি ধ্বস্ত গণ্ডিবদ্ধ-জীবন থেকে মানব-অন্তরে আনন্দমুক্তির দিকে ইশারা করছে না? তা নাহলে কবি সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলবেন কেন –

দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।
আমি দেখি।

'দেহ চায় সবুজ বাগান' কথাটির মধ্য দিয়ে কবি অন্তরের মূল সত্যটি ব্যক্ত হয়েছে। ধ্বস্ত ইট-কাঠ-পাথরের নাগরিক জীবনের একঘেয়েমি গণ্ডিবদ্ধতার মধ্যে বসবাস করতে করতে কবি কেবল হাঁপিয়েই ওঠেননি, দেহ-মন-ক্লান্ত-অবসাদে জর্জরিত হতে হতে যেন অসুস্থতার কোপে ভারাক্রান্ত – তাই তার শরীর চায় সবুজের সমারোহে নতুন করে তারুণ্যতায় জেগে উঠতে। এ যেন এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সবুজের অভিযান' –এর এক প্রতীকী রূপ। সবুজকে আহ্বান করা শহুরে জীবনের আধ-মরাদের বাঁচানোর!

গাছ এনে বাগানে বসানোর ব্যাপারটি কবির দেখার মধ্য রয়েছে কবি-অন্তরের পরম তৃপ্তি। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বাদ। কবি-কথাতেই যা স্পষ্ট –

গাছ আনো, বাগানে বসাও
আমি দেখি।

কবির 'বাগান' কল্পনা কিন্তু দার্শনিক-ভাবনার দিক থেকে অবশ্য আর এক গূঢ় অর্থের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই মানবদেহকে কবির বাগান মনে হয়েছে। প্রকৃতির ফুল-ফলের মতন আনন্দ সৌন্দর্যচর্চা মানবজীবনে সদা-সর্বদা প্রয়োজন। এটা না ঘটলে নিরানন্দ-শুষ্ক জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মানুষের দেহ ও মন দুই-ই অসুস্থতা জনিত

Scanned with CamScanner

কারণে ক্রমশঃ দুর্বল হতে হতে মরুভূমির মতন শূন্যতা ও হতাশাবোধে আক্রান্ত হয়ে জীবনের বাঁচার আস্বাদই হারিয়ে ফেলে। সবুজের সমারোহ এখানে মানবদেহ-বাগানের আনন্দ সৌন্দর্যের প্রাণস্বরূপ জীবনীশক্তিরূপে আমরা কল্পনা করতে পারি। কবিতাটি আসল মাধুর্য এখানেই।

আসলে, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেহেতু বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের নিভৃত অন্তরজগতের সঙ্গে প্রকৃতির সব রূপ-রং-গন্ধ-বর্ণ জড়িয়ে আছে, যা মানুষের ভেতর জন্মলগ্ন থেকেই আছে নানান সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে কর্মযজ্ঞে – সেহেতু মানুষের মধ্যে ভালোবাসার নীড় নির্মাণের জন্য তিনি প্রকৃতির কাছে আত্মলীন হওয়ার কথা বলেন। কাজেই, 'অঙ্গুরী তোর হরিণ্য জল' কাব্যগ্রন্থের 'আমি দেখি' কবিতাটি একটি সার্থক প্রকৃতিপ্রেম নিয়ে শেষমেষ হয়ে উঠেছে কবি শক্তিরই একটি অনবদ্য জীবনদায়ী কবিতা। জীবনের চলমান প্রবাহ সব সময় আপন আত্মবিশ্বাস ও প্রেমে বুঁদ হয়ে গতিময় থাকুক এ ছিল তাঁর একান্ত কামনা। তাই প্রকৃতির সন্তান হয়ে তিনি চান সব মানুষেরা জীবনযাপন করুক আনন্দব্রহ্ম হয়ে! তাই প্রকৃতির সবুজের সম্পৃক্ততায় আকাঙ্ক্ষা করেছেন জীবনের সমগ্রতার। মানুষকে তিনি কখনোই যেহেতু প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতায় দেখেননি বলে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পৃক্ততায় তিনি উপলব্ধি করেছেন মনুষ্যজীবনের আত্মিক উত্তরণ ও সফলতা। যা আমি দেখি কবিতাটির ফ্রেমে সুচারুরূপে উপস্থাপিত করেছেন ইঙ্গিতময়তায়। Man lives from nature, i.e. nature is his body, and he must maintain a continuing dialogue with it if is he is not to die. To say that mans physical and mental life if linked to nature simply means that nature is linked to itself, for man is a part of nature. কালমার্কস-এর এ ভাবনার সহমত পোষণ তিনি যে করতেন – তার উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ আমি দেখি কবিতাটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রকৃতিই যে মানবজীবনের আসল ঘরবাড়ি তা এ কবিতাটির ভেতর দিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন। এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যেই যে মানবের ভাবের জগৎ, মনের জগৎ গড়ে ওঠে ও সুখ-আনন্দ রচিত হয় তা-ও কবি শক্তি ঠারে ঠোরে আমাদের যেন ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন।

মাত্র ষোল পংক্তির কবিতা হয়েও কবিতাটি ব্যঞ্জনা ও অর্থ অনেক বিরাটত্বের দাবি রাখে। কবিতাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শিল্পগুণ বলতে এটাই, যা আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

দূষণের হাত থেকে নগরকে মুক্ত করার জন্য গাছ লাগানো যে একান্ত প্রয়োজন সেদিকেও কবিতাটি কিন্তু ইঙ্গিত করছে কবি-কথাতেই যা ধরা পড়ে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে কবি শক্তি

Scanned with CamScanner

চট্টোপাধ্যায়ের সচেতন বিবেকী-জীবনবাদী মানসিকতার উৎকৃষ্ট ফসল এটি তা আমরা সোচ্চারে বলতেই পারি।

সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা

বাংলা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রবেশ করেন পঞ্চাশ দশকে। যেহেতু তিনি প্রকৃত অর্থে জীবনরসের পথিক কবি ছিলেন, সেহেতু অন্তঃসারশূন্য সময় সংকটের ঘূর্ণিস্রোতে পড়ে অন্ধ-কাণা গলিতে চলতে যেমন দ্বিধান্বিত হননি, তেমনি সমাজের নিয়মশৃঙ্খলার ছন্দপতনেও ভবঘুরের মতন জ্বলেপুড়ে নিজের অন্তরের সব জ্বালা-যন্ত্রণা প্রকৃতির অমল জ্যোৎস্নায় ধুয়ে নিয়ে ফের ফিরে আসেন সত্যসুন্দর জীবনের কাছে। এবং তা করেন আত্মসমীকরণের পথ ধরে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে আত্মশুদ্ধির চৈতন্যোদ্বয়ের স্নিগ্ধ স্নানে। ফলত, এক অর্থে কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতির কাছে তিনি নিজেকে বার বার নানান রূপমূর্তিতে উন্মোচিত করেন। বলা ভালো, কবিতা হয়ে ওঠে তাঁর আত্ম-চৈতন্য অনুভবের এক-একটা নিত্য নতুন আবিষ্কার। ঠিক এরকমই একটা আত্ম-চৈতন্য অনুভবের কবিতা হল 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা'। কবিতাটি ১৯৮২ তে প্রকাশিত "যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো" কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সংকলিত হয়েছে।

'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' নামের আড়ালেই যে মানুষটির একটা চেহারা আমরা অনুভব করে নিই তা হল – এক পোড়খাওয়া জীবনসংগ্রামী মানুষের। যে মানুষটা দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে এসেছে। বলা ভালো, অনেক ভয়ংকর সময়ের সাক্ষী সে। যুদ্ধে না গিয়েও সময়ের দংশন তাকে ছাড়েনি, সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার সামাজিক পরিবেশে চলমান সংসার জীবনে, এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাপনেও। তবু যে সে ভেঙে পড়েনি, তার কারণ তার নির্ভীকতা।

কবিতাটির প্রথম স্তবকে যখন কবি আমাদের একথা বলেন –

যুদ্ধে যেতে হয়নি, তবু গায়ের ক্ষতচিহ্নে
লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা – সঠিক মনে হবে
তরবারির খর আঘাত কোনখানে পড়েনি?
একটি চোখ রক্ত-টেঁড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না – যুদ্ধে না গেলেও অনেক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার লোকটাকে সইতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন – যে লোকটার কথা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় টেনে এনেছেন সে লোকটা

Scanned with CamScanner

'মধ্যযুগের যোদ্ধা' কেন? 'মধ্যযুগ' শব্দটি এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি, ইতিহাসে মধ্যযুগ-কে এক ভয়ংকর অন্ধকার যুগ বলে ধরা হয়। সে সময় ভারতবর্ষের মানবজীবনে সব সময় যুদ্ধ, হিংসা-দ্বেষ-বর্বরতা লেগে থাকত। যুদ্ধে যেতে না হলেও আমরা এখানে স্মরণ করেত পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও কিন্তু সংকট মুক্ত হতে পারেনি। তাই কবির মনে হয়েছে, গায়ে ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে যুদ্ধে না গিয়েও। 'লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা' এ কথার মধ্য দিয়ে আবার পুরনো ভয়ংকর কালকে স্মরণ করিয়ে প্রকারান্তরে মানবিক স্খলনের দিকেই ইঙ্গিত করাতে চেয়েছেন। স্খলন বলতে আমরা ধরে নিতে পারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ বিভাজনের কথাই তিনি ঠারে ঠোরে বলতে চেয়েছেন। এ কথা বলার কারণ – নিরন্তর তাই যুদ্ধ চলছে কবির অন্তর-বাহিরে। সে যুদ্ধ নিজের সঙ্গে নিজের, প্রত্যহ বিবেকসম্পন্ন আত্মদর্শনের। অথচ, সময় পেরিয়ে যায় – কবি শেষমেষ অনুভব করেন তরবারির খর আঘাত তার শরীরে না পড়লেও সময়ের তরবারি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে জরাগ্রস্ত করে তুলেছে। কবি-কথায় 'একটি চোখ রক্ত-ঢেঁড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও।'

কিন্তু যেহেতু কবি শক্তি জীবনরসের পথিক কবি, সেহেতু তিনি তো থেমে থাকতে পারেন না? পরিজন, চেনা জগৎ থেকে সরে গিয়েও তিনি কর্তব্যে অটল থাকেন। ক্রুদ্ধ অন্তরাত্মা নিয়েও তিনি হয়ে ওঠেন আপন-অন্তরে অভিমানী। লড়াইটা ছড়িয়ে যায় জীবনরসে ভিজে আপন-প্রতিবিম্বে। কবি শক্তি তাই অকপটে আত্মপরিচয় দিতে দ্বিধা করেন না –

লোকটা যদি পাগল হতো, বাতিল করা যেতো
পাগলও নয়, ছাগলও নয়, অভিসন্ধিমূলক
সে দোষে দোষী নয়, বরং পরের উপকারী
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা, মদ্যপায়ী, ভেতো!

এখানে কবির ক্ষোভের কথা স্পষ্ট ধরা পড়ে। পাগল হলে সে তাকে সমাজে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না তা কবি জানেন। 'পাগলও নয়, ছাগলও নয়' বলার পরে 'অভসন্ধিমূলক' কথাটি এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'অভিসন্ধিমূলক' অর্থাৎ কোনও বিশেষ ধান্দা বা উদ্দেশ্য যে তাঁর নেই তা তিনি স্পষ্ট করে দেন উপকারের কথা বলে। পরের উপকার করাই যে তাঁর ব্রত তা তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেন ইঙ্গিতে। 'বরং' শব্দটির মধ্য দিয়ে তাহলে কবি কী বলতে চেয়েছেন? অভিযোগ যে একদম ছিল না তাই-কি তাকে মনুষ্য পদবাচ্য না করা? বলা ভালো, কোনও অভিসন্ধিমূলক

Scanned with CamScanner

'মধ্যযুগের যোদ্ধা' কেন? 'মধ্যযুগ' শব্দটি এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি, ইতিহাসে মধ্যযুগ-কে এক ভয়ংকর অন্ধকার যুগ বলে ধরা হয়। সে সময় ভারতবর্ষের মানবজীবনে সব সময় যুদ্ধ, হিংসা-দ্বেষ-বর্বরতা লেগে থাকত। যুদ্ধে যেতে না হলেও আমরা এখানে স্মরণ করেত পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও কিন্তু সংকট মুক্ত হতে পারেনি। তাই কবির মনে হয়েছে, গায়ে ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে যুদ্ধে না গিয়েও। 'লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা' এ কথার মধ্য দিয়ে আবার পুরনো ভয়ংকর কালকে স্মরণ করিয়ে প্রকারান্তরে মানবিক স্খলনের দিকেই ইঙ্গিত করাতে চেয়েছেন। স্খলন বলতে আমরা ধরে নিতে পারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ বিভাজনের কথাই তিনি ঠারে ঠোরে বলতে চেয়েছেন। এ কথা বলার কারণ – নিরন্তর তাই যুদ্ধ চলছে কবির অন্তর-বাহিরে। সে যুদ্ধ নিজের সঙ্গে নিজের, প্রত্যহ বিবেকসম্পন্ন আত্মদর্শনের। অথচ, সময় পেরিয়ে যায় – কবি শেষমেষ অনুভব করেন তরবারির খর আঘাত তার শরীরে না পড়লেও সময়ের তরবারি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে জরাগ্রস্ত করে তুলেছে। কবি-কথায় 'একটি চোখ রক্ত-ঢেঁড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও।'

কিন্তু যেহেতু কবি শক্তি জীবনরসের পথিক কবি, সেহেতু তিনি তো থেমে থাকতে পারেন না? পরিজন, চেনা জগৎ থেকে সরে গিয়েও তিনি কর্তব্যে অটল থাকেন। ক্রুদ্ধ অন্তরাত্মা নিয়েও তিনি হয়ে ওঠেন আপন-অন্তরে অভিমানী। লড়াইটা ছড়িয়ে যায় জীবনরসে ভিজে আপন-প্রতিবিম্বে। কবি শক্তি তাই অকপটে আত্মপরিচয় দিতে দ্বিধা করেন না –

লোকটা যদি পাগল হতো, বাতিল করা যেতো
পাগলও নয়, ছাগলও নয়, অভিসন্ধিমূলক
সে দোষে দোষী নয়, বরং পরের উপকারী
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা, মদ্যপায়ী, ভেতো!

এখানে কবির ক্ষোভের কথা স্পষ্ট ধরা পড়ে। পাগল হলে সে তাকে সমাজে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না তা কবি জানেন। 'পাগলও নয়, ছাগলও নয়' বলার পরে 'অভসন্ধিমূলক' কথাটি এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'অভিসন্ধিমূলক' অর্থাৎ কোনও বিশেষ ধান্দা বা উদ্দেশ্য যে তাঁর নেই তা তিনি স্পষ্ট করে দেন উপকারের কথা বলে। পরের উপকার করাই যে তাঁর ব্রত তা তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেন ইঙ্গিতে। 'বরং' শব্দটির মধ্য দিয়ে তাহলে কবি কী বলতে চেয়েছেন? অভিযোগ যে একদম ছিল না তাই-কি তাকে মনুষ্য পদবাচ্য না করা? বলা ভালো, কোনও অভিসন্ধিমূলক

Scanned with CamScanner

ব্যাপার-স্যাপার না থাকলেও তাঁকে যে অনেকেই ধর্তব্যের মধ্যে ফেলতা না – তা অন্যকারণে। সম্ভবত 'স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা, মদ্যপায়ী, ভেতো' হওয়ার জন্যে। তবু এরই পাশাপাশি তিনি জানাতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না সে যদি সত্যিই অভিসন্ধিমূলক মানুষ হতেন তাহলে তিনি কখনই কিন্তু 'স্বাধীনচেতা' ও পরের উপকারী হতেন না। যেহেতু কবি শক্তি জীবনরসের পথিক কবি তাই ক্ষোভ-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হলেও জীবনের কাছেই ফিরে আসেন শেষ পর্যন্ত। ক্ষোভ বলুন, অভিমান বলুন – যা কিছু তার জীবনকে ভালোবেসেই। জীবনের কাছ থেকে তিনি দূরে সরে থাকতে পারেন না বলে যত ক্ষোভ-অভিমান তাঁর জীবনযাপনে শ্লেষের তীব্রতার ছড়িয়ে পড়ে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মশ্লাঘায়। কবি শক্তি তাই শেষমেষ বলতে বাধ্য হন –

অসুখ এক উদাসীনতা, অথচ সামাজিক
লোকটা কিছু রহস্যময়, লোকটা কিছু কালো
নিজের ভালো করেনি, তাই, অন্যে করে ভালো
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা কিছুটা নির্ভীকই।

এখানে লক্ষণীয় যেটি তা হল – লোকটা উদাসীন, অথচ সামাজিক। স্বভাবতই আমরা যে নিজেকে ভাল করে কখনই চিনে উঠতে পারি না – সে কথার দিকেই কবি ইঙ্গিত করছেন। কবিও যে অন্তরসন্ধানী তা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা না। এ কারণে লোকটা 'কিছু রহস্যময়', তাই দোষ স্বীকার করতে তিনি পিছপা হন না। লোকটা রহস্যময় এবং উদাসীন হলেও কিন্তু যেহেতু সামাজিক, সেহেতু নিজ স্বার্থসিদ্ধি, অর্থাৎ নিজের ভালো না করলেও সে কিন্তু অন্যের ভালো করে। এই ভালো করার ইচ্ছের মধ্যে রয়েছে লোকটার পরোপকারী মন।

প্রাবন্ধিক রুদ্রপ্রতাপ দত্ত-র ক-টি কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পরে। তিনি জানিয়েছেন –

ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ ছুঁড়ে ফেলে আগামী দিকে হাত বাড়ানো শক্তি, যোদ্ধা শক্তি, কবি শক্তি যুগ অতিক্রম করে যান সংসারে সন্ন্যাসী শব্দবন্ধের প্রয়োগে। সন্ন্যাসী অর্থে যিনি বৃহত্তর কল্যাণচিন্তায় সংসারত্যাগী। কিন্তু শক্তি সংসারে সন্ন্যাসী। তিনি উত্তরকালের উদ্গাতা। সংসারে থেকেই সন্ন্যাসীর সেই কাজ করে যেতে চান। জীবনের প্রতি কী প্রবল আসক্তি তাঁর। এত আঘাত এত বিরূপতা সত্ত্বেও এই পরিমণ্ডলে থেকেই সোনালী দিন আনতে চান শক্তি। আর এ কাজে যোদ্ধাকে যে নির্ভীক হতেই হয়।

Scanned with CamScanner

তাই সকলের কল্যাণ সাধনের বার্তার মাঝেই রেখে যান অনাগত বিপ্লবের বীজ। আর রহস্যময় যোদ্ধার আড়ালে খুঁজে নিই আমাদের প্রিয় কবিকে।

যথার্থ বলেছেন রুদ্রপ্রতাপবাবু। তবে, একটা কথা এখানে না বলে পারছি না – সংসারে লোকটার নির্ভীকতার পেছনে কিন্তু রয়েছে যেমন জীবনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা – যে জন্য সংসারে সন্ন্যাসী হয়েও সংসারের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। সংসার বলতে বৃহৎ মানবসমাজকে ধরতে হবে। কীসে সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলসাধন হয় সব দুর্দিন-দুঃসময় সরে গিয়ে। এই মহতী-চিন্তার ভেতরে যে রয়েছে লোকটা, ওরফে কবির তীব্র আকুলতা তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই কবির অন্তরের ভেতরে যে রয়েছে এক অনাগত বিপ্লবের বীজ, যা কবির আত্মপ্রত্যয়জনিত বাসনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে এ কথা যদি মেনেও নিই – তবে একটি কথা বলতে কিন্তু বাধ্য হচ্ছি – লোকটাকে, ওরফে নিজেকে রহস্যময় যোদ্ধার আড়ালে যতই 'সংসারে সন্ন্যাসী' বলে চিহ্নিত করুন না কেন – শেষমেষ কি আদৌ তা থাকছে? না। কেননা, সংসারে উদাসীনভাবে কথা বলে নিজেকে কবি (লোকটা) যতই 'সংসারে সন্ন্যাসী' বলে সোচ্চার হোন না কেন – আদপে তিনি একজন উদারমনস্ক গৃহী-ই। এ কথা বলার কারণ, যদি তিনি প্রকৃত 'সংসারে সন্ন্যাসী' হতেন তাহলে নিজেকে কখনই 'সামাজিক' বা 'রহস্যময়' বলে চিহ্নিত যেমন করতেন না – তেমনি নিজেকে 'কালো' বলে চিহ্নিত করে নিজের ভালো-মন্দের কথা তুলতেন না। সন্ন্যাসী তাঁরাই – যারা কর্মে – যজ্ঞের পুরোহিত হলেও ভাবে-ভাবনায় থাকেন সর্বদা নির্লিপ্ত। যদিও মানবসভ্যতার মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত থাকাই তাঁদের একমাত্র ব্রত।

এসব ভালো কবি শক্তি যতটা না 'সংসারে সন্ন্যাসী' তার চেয়ে বেশি জীবনরসের পথিক-গৃহী বলাই সঙ্গত বলে আমি মনে করি। 'পথিক-গৃহী' মানুষেরাই পারে মানবসমাজে কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকতে 'রহস্যময় যোদ্ধা' হয়ে।

তবে, এ কবিতাটি যে রসে-ছন্দে কারুকার্যে সুখপাঠ্য তা বলা যেতে পারে। বলা যায়, শিল্পগুণে একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা।

Scanned with CamScanner

উপসংহার (Conclusion)

বাংলা ভাষার সাহিত্যিক শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাব্য, ছড়া, উপন্যাস, কিশোরসাহিত্য সমালোচনা, অনুবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় পঞ্চাষের অধিক বই রচনা করেছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত ছেঁড়া তমসুখ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। উপসংহারে আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্য গুলি সূত্রাকার বলা যায় –

১) এ কবিতা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাতজাত। পরিণামে কবিতায় জীবনের ক্লান্তিও নৈরাশ্যবোধ এর পরিচয়ে ফুটেছে।

২) দেশি বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে বিশ্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মনস্কতা এযুগের কবিতার অন্যতম লক্ষণ।

৩) ফ্রয়েজীয় মনোবিজ্ঞান, মার্ক্সীয় দর্শন, আধুনিক কবিতায় অনেকটা স্থান করে নিয়েছে।

৪) জগৎ জীবন সম্পর্কে একটি অনিকেত ধারণা থেকে প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সংশয় ফলত দেহজ কামনা বাসনা এবং প্রেমের শারীরী রূপের বর্ণনায় আসক্তি।

৫) কবিতায় মননের প্রাধান্যের কারণে দেশ বিদেশের ইতিহাস, দর্শন রাষ্ট্র ও সমাজ, কাব্যভাষা ও চিত্রকল্পে বহুব্যবহারে ও কাব্যে দুরূহতা এসেছে।

৬) কাব্য দেহে বাক্ রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটায় গদ্য ও কাব্যের ব্যবধান কমেছে। গদ্যছন্দের চলতি ও গ্রাম্য দেশি শব্দের সঙ্গে বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার ঘটেছে।

৭) প্রচলিত কাব্য ভাষা ও উপমা-চিত্রকল্পের পরিবর্তে বিদেশি এবং নতুন নতুন উপমা-চিত্রকল্প রচনা করে বিশেষ ব্যঞ্জনা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পর্বের অনেকের কবিতায় শব্দ প্রয়োগ হল সুমিত ও অর্থধন।

৮) বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। একালের কবিরা উপরিউক্ত লক্ষণগুলি পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাব্যচর্চায় প্রয়োগ করে রবীন্দ্রিক ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শৈলীতে রূপায়িত করে এবং আধুনিক চিন্তা ও দর্শনকে রবীন্দ্রিক প্রকাশভঙ্গি, শব্দ, ছন্দ ও চিত্র রচনা করে রবীন্দ্র ঋণের সদ্ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য ধারা এ কালের কবিদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ২০শ শতকের কবিদের অবস্থান হেতু তাদের রচনায় এ সময়ের বিষয়বস্তুর নবত্ব ও বক্তব্যের স্পর্ধিত ও সরল উপস্থাপনা সংহত কাব্যকলায় প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এ কালের এই কবিতা গুলিকে বুঝি।

Scanned with CamScanner

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

আকরগ্রন্থ

১. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা – শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

২. আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় – অশ্রুকুমার শিকদার।

৩. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় – দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৪. কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা – বীতশোক ভট্টাচার্য।

৫. আধুনিক বাংলা কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ – জীবেন্দ্র সিংহরায়।

৬. গদ্য সংগ্রহ – সুধীর দত্ত।

৭. আমার কালের কয়েকজন কবি – জগদীশ ভট্টাচার্য।

৮. প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায় – গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, মানুষের যুগ (প্রবন্ধ) – সুমিতা চক্রবর্তী।

১০. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা নাগরিক জরাসনের মন (প্রবন্ধ) – আবুলফজল।

Scanned with CamScanner